ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 2013-2021
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.426

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় ও সমাজ

দীপঙ্কর সরকার, *গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:
Narayan Gangopadhyay's literary career began with poetry. And in this poem he advanced on the path of this establishment as a short story writer. However, Narayan Gangopadhyay painted a picture of the life of that apocalyptic period in short stories that can't be told in poetry. Because he was born into the horrors of the First world war and the madness of the Russian Revolution, and when he grew up, it was the madness of the second world war. A strong protest against World war, smuggling, black market, starvation, poverty, exploitation and oppression became inevitable for the humanitarian Narayan Gangopadhyay. So Narayan Gangopadhyay look short story as a tool. A time collision may shape a writer's vision of life. Time may give the material to the writer. Then the responsible and humane literary person became the artist of the age. In term of content, Narayan Gangopadhyay has selected stories and characters from various contexts and categories. Age artist wrote stories in the context of war, riots and faminers. Thus by seltering these he finally attains an eternal being. Regardless of time, the country has accepted the people of different classes of society such as strongmen, hoarder, black marketeer, tea garden coolie, state owner, priest, educated, santali woman, geo-tourist, historian Rai Bahadur etc. He had no choice any class. He chose characters from all walks of life. His presentation style was amazing introduction. Narayan Gangopadhyay excels at creation multi-dimensional characters. That is why his character does not end in time, but is etemal.
Key words: First world war, madness, russian revolution, smuggling, black market, starvation, various contexts and categories, multi-dimensional characters.

প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর-কল্লোল পর্বের একজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার। কল্লোল-কালিকলম পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র কিংবা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুসারী ছিলেন না নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, কালোবাজারি, মজুতদারি, চোরাকারবারি, নারীর অবমাননা এবং অবক্ষয়িত মানবিক

আবেদন, বিপন্নতার আবহে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন রক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রমুকেরা। এছাড়াও এ সময়ের অন্যান্য কথাকারদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী, সুশীল রায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অমরেন্দ্র ঘোষ, সমরেশ বসু, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, শান্তি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক, সৌমেন চন্দ, বারীন্দ্রনাথ দাশ, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, মিহির আচার্য প্রমুখ। এইসব ছোটগল্পকারের লেখার বিষয়-রীতির অভিনবত্বে, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের স্রোতধারায় ছোটগল্পের নতুন জগৎ গড়ে উঠল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তথা এই সময়ের লেখকদের সাহিত্য বিকাশের কালটি ছিল আলো-বাতাসহীন মহাকাল। এই সময়ের কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা লেখকের সৃজনশীল হৃদয়কে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। ঘটনাগুলি হল-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), ১৯৪১ এ কলকাতায় জাপান-বোমা নিক্ষেপ, ১৯৪২ এর আগস্ট বিপ্লব ও মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যা, ১৯৪৩ অর্থাৎ ৫০ এর মন্বন্তর, ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৭ এর দেশভাগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব যেভাবে কল্লোল-কালি কলমের লেখায় প্রভাব পড়েছিল, পরবর্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাবেও বদলালো না সমাজ, মানবজীবন। স্বাভাবিকভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সমকালীন ছোটগল্পকারদের লেখাতেও তার প্রভাব মুক্ত রইল না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সমকালীন আরও পাঁচজন ছোট গল্পকার যথা সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ভূষণ ঘোষ এবং সন্তোষকুমার ঘোষের আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচনায় বলেছেন –

> "যুদ্ধে তান্ডব, মূল্যবোধের ভাঙন, অহিংস-সহিংস আন্দোলনের চড়াই-উতরাই সাম্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী গণ আন্দোলন, মন্বন্তর, আগস্ট আন্দোলন- সমস্ত মিলেমিশে এক রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রকৃতি এরা অনুভব করেছিলেন নিজের নিজের ক্ষমতা মতো।"[১]

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় ভয়ংকর দাঙ্গা শুরু হয়। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বরিশাল, পাবনাতে দাঙ্গা বাঁধে। কলকাতার দাঙ্গায় বহু মানুষ নিহত ও আহত হয়। স্টেটম্যান পত্রিকা এই হত্যাকাণ্ডকে- The Great calcutta killing আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এইসব ছোটগল্পকারদের লেখায় উঠে গেল যুদ্ধের ভয়াবহতা, কালোবাজারি, চোরাকারবারির জ্বলন্ত ছবি। বস্ত্র সংকট, খাদ্য সংকট, বিপন্ন সাধারণ মানুষের অসহায়তার ছবি ফুটে উঠলো ছোটগল্পে। যুব সমাজের বেকারত্বের নগ্ন ছবি যেমন অঙ্কিত হল, তেমনি চিত্রিত হল মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থপরতা, শঠতা, নারীর অবমাননা, নৈতিক অধঃপতনের কাহিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে একদল সুযোগ সন্ধানী দালাল গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তারা ছিল সামরিক বাহিনীতে রসদ সরবরাহ করে হঠাৎ বড়লোক হওয়ার ধান্দাবাজ শ্রেণিভুক্ত। কৃত্রিম খাদ্য সংকট তৈরি করে সমাজকে বিপর্যস্থ করে তুললো তারা। ফলে ১৩৫০ এ দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। গ্রামের মানুষ অভাবের তাড়নায় পা বাড়ালো শহরের পথে। 'নবান্ন' নাটকে তার নিদারুণ ছায়াপাত ঘটেছে। ১৩৫১ এর সেরা গল্প এর সম্পাদনার 'প্রারম্ভে' সম্পাদক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যুদ্ধবিধ্বস্ত, মন্বন্তর পীড়িত বাংলার যে ছবি এঁকেছেন তার উল্লেখে স্পষ্ট হবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও যুদ্ধের আবহে চোরাকারবারি, কালোবাজারি, মজুতদারির জ্বলন্ত নিদর্শন 'নক্রচরিত' গল্পটি। গল্পটি 'শারদীয়া যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গল্পের অন্যতম চরিত্র নিশিকান্ত কর্মকার বৈষ্ণব অবতার আবরণে থাকা পাকা শয়তান। পাশবিক সত্তা তার অন্যতম লক্ষ্য। তাই চোখ দুটো শকুনের মতো মনে হয়। কপালে এলোমেলো সরীস রেখা। একদিকে

সে মদনের কাছ থেকে জলের দরে চোরাই সোনা কেনে। অন্যদিকে বৈষ্ণবীয় তিলক এঁটে হাড়ির মেয়ে কষ্টবালাকে সেবাদাসী বানিয়ে নাম রাখে তার বিশাখা। এখানেও আবরণ। কষ্টবালার উপর রাধাভাব জাগিয়ে হয়ে যায় বিশাখা। নিজে গত যৌবন হলেও নিজের সেবাদাসীকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে ইব্রাহিম দারোগাকে বশ করেছে নিশিকান্ত। এই ইব্রাহিমই নিশিকান্তকে ‘ঘোড়েল’, ‘ভুঁড়ো কুমির’ বলেছে। ‘নক্র’ অর্থে কুমির। নিশিকান্ত যুদ্ধের পটভূমিকায় কালোবাজারি, মজুতদারি, চোরাকারবারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আর নিশিকান্তের কর্ম বৃত্তান্ত নক্রচরিতেরই প্রকৃতরূপ।

নিশিকান্তের গোলাঘরে আটশো মন চাল মজুত আছে, অথচ দুর্ভিক্ষে খাদ্যের অভাবে মতিপাল মারা গেছে। অভাবের তাড়নায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে মতি পালের বউ। অপঘাতের মৃত্যুর জন্য নিশিকান্ত দায়ী করেছে দৈবকে। নিশিকান্ত শুধুমাত্র চাল ব্যবসায়ী নয়, সে প্রেসিডেন্টও। তবুও সে অমানবিকতার চূড়ান্ত। তার গোলা ঘরে রাখা চালের কিছু বর্ষার জল পেয়ে পচে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। তবুও বিপদে কাউকে সে এক ছটাক চাল দেয়নি। যুদ্ধের আবহে নিশিকান্তদের নিশংস আচরণকে গলির গরুর দেহকে ঘিরে থাকা কুকুর ও শকুনের ঘৃণিত লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন লেখক।

শিকার ধরার জন্য কুমিরের কপটতা কিংবা তার মায়া কান্নার সঙ্গে নিশিকান্তের বৈষ্ণবীয় আচরণ এক হয়ে গেছে। আপাতভাবে গোটা দেহ তার কদম্বকেশের মত অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবে রোমাঞ্চিত। আর ভেতরে ভেতরে চোরাকারবার ও মজুদদারিতে সে এক নম্বর। তাই যে নিশিকান্তের রাতের অন্ধকারে চাঁদ হিসেবে জগৎকে আলো দেখানোর কথা গল্পে শেষ পর্যন্ত সে নিশি হয়ে গেছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র অন্ধকারের প্রতীক হয়ে উঠেছে সে।

‘নক্রচরিত’-এর নিশিকান্ত কর্মকার যে গোত্রের ‘দুঃশাসন’ গল্পের দেবীদাসও অনেকটা তাই। ‘দুঃশাসন’ আশ্বিন, ১৩৫২, প্রকাশক-বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। উৎসর্গ-সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, বন্ধুরেষু। গল্পের সংখ্যা মোট ৯টি। এই গল্প গ্রন্থটিও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলীর দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ‘নক্রচরিত’-এ আছে খাদ্য সংকট আর ‘দুঃশাসন’ গল্পে বস্ত্র সংকট। মহাভারতের অনুষঙ্গে গল্পের বস্ত্র সংকটকেই প্রতিকায়িত করে।

ছোট গায়ের ছোট বন্দরের বড় ব্যবসায়ী দেবীদাস। প্রকৃতপক্ষে কাপড়ের আড়তদার। খুচরো, পাইকারি সব ধরনের কারবারে সে সিদ্ধহস্ত। যুদ্ধের বাজারে সভ্যতার সংকট-অন্ন ও বস্ত্রের হাহাকার। ইজ্জত রক্ষার জন্য বস্ত্রের সন্ধানে এসে গল্পের প্রথমেই এক ভদ্রলোক হাউ হাউ করে কেঁদেছে দেবী দাসের সামনে। দেবী দাসের পাথরের মন তাতে গলেনি। দেবী দাস যুদ্ধ কিম্বা আকালের জন্য ভগবানের দোহায় দিয়েছে। অথচ এইসব আড়তদারেরা ভয়ে, পুলিশকে সহজেই ৫০ টাকা চাঁদা দেয়। এই গল্পে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-

এক: গৌড়দাস চরিত্র। দেবী দাস সম্পর্কে তার কাকা। এখনো গৌর ঠিকমতো ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারেনি। তাই তার মধ্যে বিবেক রয়ে গেছে। পুলিশ পঞ্চাশ টাকা ঘুষ নিয়ে গেলে কাকা দেবীদাস, গৌরকে রেগে বলেছে পুলিশ রক্তচোষে বলেই থানার রং লাল। কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে গৌরদাসের চোখে ভেসে ওঠেছিল দেবীদাসের সাদা বাড়ির ছবি, সেইসঙ্গে হাড়ের ছবি। অর্থাৎ দেবীদাসও যে মানুষকে শোষণ করে তার ইঙ্গিত ছিল সেই ভাবনায়।

দুই: থানার দারোগা শচীকান্তের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে 'দুঃশাসনের রক্তপাত'। প্রতীকী ঘটনায় গল্পে তৈরি হয়েছে নাটকীয় দ্বন্দ্ব। একদিকে বস্ত্র সংকট অন্যদিকে সেই সংকটময় সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুঃশাসন দ্বারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

তিন: যাত্রাপালা শেষ হতে হতে ভোর হয়ে গেছে। অন্যদিকে রাতেই একটি শিশুকে শিয়ালে খেয়েছে। দেবীদাস যাত্রা শুনে ফেরার পথে জুতো আনতে মুচিপাড়ায় লক্ষ্মণের কাছে যায়। একটি ষোল বছরের মেয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে জল নামছিল। মেয়েটির –

> "কোনোখানে একফালি কাপড় নেই-কাপড় পরবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[২]

জাগ্রত বিবেকের মত শুধু গৌরদাসের মনে হয়েছে, যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করল তাকে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে অথবা প্রাণ দিতে হবে কুরুক্ষেত্রে ? কেননা প্রতিশোধ, প্রতিরোধের শাণিত প্রস্তুতি লক্ষ্য করেছে গৌর দাস। যা বেরিয়ে আসছিল মাঠে কাজ করা একদল লোকের ধারালো হেঁসোগুলো থেকে। আরোপিত সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেখক গল্পে শোষিতের জয় দেখাননি, বরং সমকালের বাস্তব চিত্রই এঁকেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের হেঁসোর শাণিত ঝলকানিতে ফুটে ওঠা সাধারণ প্রতিরোধের ইঙ্গিত গল্পটিকে মহিমান্বিত করেছে।

যুদ্ধের আবহে নির্মিত আরও একটি ছোটগল্প 'ডিম'। নদীর ওপারে বড় জংশনটার গায়ে মিলিটারি কলোনির পাশে অনাবাদি জমিতে তাবু খাটানো হয়েছে সেনাবাহিনীর যুদ্ধ লেগেছে। আহারের জন্য তাই প্রতিদিন ৫০০ ডিম চাই। অথচ মন্বন্তরের আঁচে পেটের দায়ে সাধারণ মানুষ হাঁস মুরগি বেঁচে দিয়েছে। শুধু সেনাবাহিনীর জন্য নয়, ক্রিস মাসে কেক বানানোর জন্যও চাই ডিম। অথচ ডিমের আকাল। সাধারণ মানুষ যেখানে খেতে পায় না, সেখানে ক্রিস মাসে কেক খাওয়ার প্রসঙ্গ বড্ড বেমানান মনে হয়। আর এই ডিম সরবরাহের জন্য মেজর সাহেব দায়িত্ব দিয়েছেন ঠিকাদার প্যারীলালকে। আর এই ডিম সংগ্রহকে কেন্দ্র করেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি অমানবিক বৈষম্যের ছবি এঁকেছেন গল্পে।

সাহেবদের অনুগত ঠিকাদার প্যারীলারের দু'পায়ে মোজা, লেদারের জুতো, দু'হাতে পুরু দস্তানা। কানে, গলায় বাঁধা আছে মাফলার। তার ওপর সে গায়ে শতচ্ছিন্ন ধোকড়া। ঠান্ডায় তার শরীরের অঙ্গগুলো অসাড় হয়ে আসছে। এই রজনীকেই প্যারীলাল তিনজন ডিম সংগ্রহ করার কথা বলে।

রজনীর পুত্রবধূ সারদা। তার বছর আটেকের ছেলেটা ম্যালেরিয়ায় ভুগে মৃতপ্রায়। পিলেটা বড়, অপুষ্টিতে শরীর প্যাঁকাটির মতো শীর্ণ। গায়ে ছেঁড়া চট। পথ্যের বদলে ছেলেটি মাটির মালসা থেকে থাবায় থাবায় মুখে পড়ছে শুকনো ভাত। এদের জীবন যেন পশুর থেকেও অধম। তাই ছেলেটির হাতকে থাবা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন লেখক। সারদার বাচ্চা মেয়েটির দেহও কঙ্কালসার। রজনীর ছেলে নিবারণ শহরে রিক্সা টানতে গেছে। দু'মাস তার কোন খবর নেই। দশ আনা কমিশনের আশায় রজনী অবশেষে চল্লিশটি ডিম সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। আর এরপরেই শুরু হয়েছে কাহিনির নাটকীয় দ্বন্দ্ব।

ম্যালেরিয়া জীর্ণ ছেলেটি ডিম খাবার আবদার করে। সারদা ছেলেকে বোঝায়-গরিবের ডিম খেতে নেই। রজনী নাতিকে ধমক দিয়ে বলে, ডিম খেলে তাকে রজনী খুন করে ফেলবে। অবশেষে রজনী সেই প্রচেষ্টাই

করে। ছেলেটার গলায় একটা নির্মম থাবা বসিয়ে টিপে ধরে। রজনীর কঠিন খাবার আটকে পড়ে ছেলেটি যখন মরছে তখন নিরুপায় সারদা শাবলের ঘা বসিয়ে দেয় রজনীর মাথায়। পাশেই জল ছিল গনগনে আগুন। ছেলেটি নিঃসাড় ছিল, রজনী ও আগুনের সজ্জায় মাথা রেখে নিঃসাড় হল। পোড়া মানুষের একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এল। অন্যদিকে ঠিকাদার দালাল প্যারীলাল দূর থেকে দেখল সমস্ত গ্রামটা জ্বলছে, শীতে যেন আগুন পোয়াচ্ছে গ্রামটি। এই প্যারীলালের চিরকাল আগুন জ্বালিয়ে তার থেকে নিজেকে দূরে রেখে উল্লাস করেছে।

হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের মধ্য দিয়েই 'ইজ্জত' (প্রথম প্রকাশ 'শারদীয়া যুগান্তর' ১৩৫৪) গল্পটি অগ্রসর হয়েছে। প্রবাল দ্বীপের মত গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের বহুকাল যাবৎ সহাবস্থান গ্রামের মধ্যে ফাঁকা মাঠের ভিতরের একদিকে ফকিরের সমাধি। তার অনতিদূরে ডাকাতে-কালীর স্থান। এই ফকিরের ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে গেছে আরো এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ডাকাতে-কালীর ইতিহাস। এত বড় মাঠের মধ্যে বহুকাল ধরে বাস করে এসেছে ফকির আর ডাকাতে-কালী। বিরোধ বাঁধেনি কোনদিনই। কিন্তু এক মৌলবী এসে 'ওয়াজ' করার পরেই মুসলমানদের পক্ষ থেকে 'ধলা মন্তাই', হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি জগন্নাথ সরকারকে জানিয়ে গেল- এরপর থেকে হিন্দুরা ডাকাতে-কালীর থানে পুজো করতে পারবে না। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হিন্দুরা চরম অপমানিত হয়ে পুজো করার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিল। শুরু হলো লড়াই। একদিকে কালী মাঈকি জয়, অন্যদিকে আল্লাহ আকবর।

মুসলমান সমাজের আসল মাথা কিন্তু হাবিব মিঞা। সৌখিন মানুষটির মোট বিবির সংখ্যা বারো। এখনো যে চারজন বিবি বর্তমান তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ লাল বিবি হাবিব মিঞার সবচেয়ে আদরের। হাবিব মিঞা জোতদার, চাষের সময়ে জমিতে তার বারোখানা নাঙল নামে। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার আর ফুড কমিটির সভাপতিও।

হিন্দু-মুসলমান লড়াইয়ে হাবিব মিঞা হিন্দু ধর্মের প্রধান জগন্নাথ সরকারকে হত্যা করার জন্য ধলা মন্তাইকে পরোচিত করে। জগন্নাথের অবর্তমানে যাতে হাবিব মিঞা তার দেড় বিঘা জমি সহজেই হস্তগত করতে পারে। সাম্প্রদায়িক আবহে গল্পটি অগ্রসর হলেও এটি শেষ পর্যন্ত বস্ত্র সংকটের নিদারুণ নির্মমতার গল্প হয়ে উঠেছে।

জগন্নাথ সরকারকে হত্যা করার শালা পরামর্শ করার পর ধলা মন্তাই হাবিব মিঞার কাছে নিজের স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের জন্য দু একটি কাপড় ভিক্ষা চেয়েছে। কিন্তু পাষাণ-হৃদয় হাবিব বত্রিশ টাকা জোড়া কাপড় মন্তাইকে বিলিয়ে দিতে নারাজ। তাই সে মন্তাইকে বলেছে, তার কাছে এক ফালি কানিজ পড়ে নেই। ব্যর্থ মনে ফিরে আসার সময় অন্ধকারে চরম শত্রু জগন্নাথের সঙ্গে মন্তাইয়ের ধাক্কা লেগেছে। জানা গেছে, জগন্নাথও তার স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের জন্য দুই একখানা কাপড়ের প্রত্যাশায় হাবিব মিঞার কাছে যাচ্ছে। মন্তাইও একই সমস্যার কথা জগন্নাথকে জানায়। মন্তাইয়ের কাছ সব শুনে জগন্নাথও বুঝতে পারে হাবিব মিঞার কাছে কাপড় চেয়ে কোনো লাভ হবে না।

এরপরের ঘটনা চরম নাটকীয়। হাবিব মিঞার ছোট বিবি লাল বিবি হঠাৎ ভেদবমিতে মারা যায়। তাকে কবরস্থ করার রাতেই হাবিব মিঞার কাছে খবর আসে, দু'জন লোক কাফনের কাপড় চুরি করতে কবর থেকে মাটি তুলছে। দলবল নিয়ে হাবিব মিঞা ওই দুইজন লোকের মুখে টর্চ জ্বালতেই হতবাক হয়ে যায় সকলেই। দু'জনের একজন হল ধলা মন্তাই, অন্যজন জগন্নাথ সরকার। হিন্দু-মুসলমানের বিপদজনক

সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের মধ্যে না গিয়ে গল্প শেষ হয়েছে বস্ত্রসংকট--সমাধানের চরম বিস্ময়কর মরিয়া প্রচেষ্টায়। বস্ত্র সংকটের ভয়াবহতায় ধর্ম সংকট ও পরাজয় স্বীকার করেছে। তাই গল্পের শেষে প্রশ্নটি ব্যঞ্জনাবাহী-

"ফকির আর কালীর ভেতরে এত সহজে মিটমাট হয়ে গেল কেমন করে?"[৩]

গল্পটিতে হাবিব মিঞা, ধলা মন্তাই শেষ পর্যন্ত কোন মুসলমান সমাজের কিংবা জগন্নাথ সরকারও হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেনি। সমাজের যে দুটি ধারা স্পষ্ট হয়েছে এখানে সেই দুটি হল-

এক: হাবিব মিঞা শোষকশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে শ্রেণি শত্রু হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করেছে।
দুই: সাধারণ শোষিত, বঞ্চিত মানুষ হিসাবে ধলা মন্তাই এবং জগন্নাথের সংকট একই প্রকার।

ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে হাবিব মিঞার চিরকাল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি লাভ করতে চায়। বস্ত্র সংকটে মানুষ কতটা অসহায়, কাফন চুরি করার ঘটনা থেকে পাঠক তার সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন।

'কবর' গল্পটি 'বর্ষাশেষ' পত্রিকায়, অগ্রহায়ণ, **১৩৫১** বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায়। আলোচ্য গল্পে হতদরিদ্র ঘরে জন্মানো, অন্যের ঘরে ঝি-গিরি করা মায়ের সন্তান শা-নওয়াজই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যুদ্ধের সময় শুধুমাত্র বাসের কন্ট্রাক্ট পেয়ে হঠাৎ বড়লোক হওয়া এই চরিত্রটি পাঁচ গুণ বেশি দামে গাড়ি কিনে গল্পকথককে সঙ্গী করে তার আদি বাসভূমির গ্রামের দিকে ছুটে চলেছে। শোষক, অত্যাচারী, উচ্চকোটিতে বসবাসকারীর যা যা মানসিকতা তাই রপ্ত করেছে সে। জীবনে পোড় খাওয় শা-নওয়াজ যুদ্ধের সময় নানান অমানবিক সুবিধা গ্রহণ করেছিল। অকপট স্বীকারোক্তিতে সে জানিয়েছে, রাশি রাশি মিথ্যা কথা বলে ব্যবসায় সে লাল হয়ে গেছে। শুধু লোক নয়, দেশকেও ঠকিয়েছে সে। পঞ্চাশ লাখ মরা মানুষের রক্ত মাখানো টাকায় সে গাড়ি কিনেছে।, বাড়ি কিনেছে। কলকাতায় মরা মাড়িয়ে রাস্তা পেরিয়েছে সে। কঙ্কালসার মানুষগুলি একটু ফ্যানের আশায় কেঁদেছে। তাদের খাবার না দিয়ে সে কুকুরকে খাবার দিয়েছে। মানুষগুলো খাবার চেয়ে পেয়েছে চাবুকের আঘাত।

যে গ্রামে শা-নওয়াজ বড় হয়েছে, সেই গ্রামে যুদ্ধের করুন পরিণতিতে বিধ্বস্ত। তার পূর্বকার মালিক অর্থাৎ মোড়লের বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। মাটির বাড়িগুলো মাটিতে মিশে যাওয়ার উপক্রম। গ্রামের রাস্তায় মোটর গাড়ি এগোচ্ছে না, আটকে যাচ্ছে। কেননা রাস্তাঘাট জুড়ে মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে। এইভাবে সমগ্র গল্প জুড়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতির আবহ ফুঁটে উঠেছে।

মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ কিংবা কৃত্রিম খাদ্য সংকটের নির্মম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'কালোজল'-এ। গল্পটি শারদীয় আনন্দবাজারে, **১৩৫১** বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। কর্মহীন বেকার যুবক তারাপদ শ্বশুরবাড়ি থেকে অভিমান করে চলে যাবার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত। অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তারাপদ শ্বশুরবাড়িতে ফিরছে জানকী কেমন আছে-এতদিন পর দেখা হবার অপার উচ্ছ্বাস। কিন্তু বদলে গেছে গ্রাম। কীর্তন কিংবা রয়ানি গানের সুরে উত্তাল গ্রামগুলি নিরব। যারা বেঁচে আছে তারা মানুষ নয়, অবয়বহীন ছায়ামাত্র। তারাপদর শ্বশুর জানকি চক্রবর্তী কালেরায় মারা গেছে। স্ত্রী অরুণা অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছে। তারাপদকে নৌকায় নিয়ে এসেছিল শীতল। শীতল প্রকৃতপক্ষে এই দুর্ভিক্ষ, খাদ্য সংকট, চালের চোরাচালানকে প্রত্যক্ষ করেছে। গ্রাম জীবনের ধ্বংসের ছবি ধরা পড়েছে তার দৃষ্টিতে।

লেখক এই শীতলকে কেন্দ্র করে তারাপদর সংসার জীবনের করুন কাহিনি থেকে ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে চলেছেন মথুরা দাসের চাল চোরাচালনের নৃশংস লোভের ঘূর্ণবাতে। মথুরা দাসদের লোভের তাড়নায় ধ্বংস হয়েছে গ্রাম। এই দেশ দুর্ভিক্ষে গ্রামগুলো যত শ্মশান হয়েছে, মথুরা দাসদের কড়ির পাহাড় হয়েছে ততো উঁচু। নৌকার মাঝি নিরুপায়। মনে মনে সে ভেবেছে-এটা অন্যায় তবুও নৌকায় করে মথুরা দাসের চুরি করা চাল বয়ে নিয়ে গেছে সে। যাবার পথে টর্চের আলো জ্বলে উঠলে পুলিশের প্রশ্নের উত্তরের শীতল মিথ্যা বলেছে, নৌকায় মালপত্র নয়, সোয়ারি আছে। ভেদবমি করছে সোয়ারি। তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আসলে মনে মনে শীতল, মথুরা দাসের ভেদবমি কামনা করেছে।

গল্পে মথুরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। লেখক তা করতেও চাননি। তিনি সমকালীন বাস্তবতার চিত্রই আঁকতে চেয়েছেন। বরং প্রতিকী ইঙ্গিতে লেখক এইসব অমানবিক ঘটনাগুলি বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যম হিসেবে প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাই আড়িয়ল খাঁ নদীর জল সাদা থেকে কালো হয়ে গেছে। নিঃশব্দে দংশন করা সাপের ক্ষিপ্র গতিতে নিজের বিষাক্ত বিবরে লুকানোর সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছে কালোজলের বয়ে চলা।

এরপর আসে ‘পুষ্করা’ (দেশ, প্রথম প্রকাশ ৭-ই মাঘ ১৩৫৯) গল্পের প্রসঙ্গ। মহামারিতে গাঁয়ের পর গাঁ উজার। কলেরার মড়কে দশ খানা গ্রামে চলেছে মৃত্যুর মিছিল। তাই তিথি না মেনেই অসহায় গ্রামবাসী শুক্লাচতুর্দশীতে শ্মশানকালী পুজোর আয়োজন করেছে। একদিকে মড়ক, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ-

> “মৃত্যু যেন চারদিক থেকে কালো কালো হাত বাড়িয়ে মানুষকে তেড়ে আসছে -একেবারে সমস্ত গ্রাম না করে তার খিদে আর মিটবে না। না খেয়ে মরেছে, খেয়ে কলেরা হয়ে মরেছে। পুষ্করার বাকি আছে কোথায়।”[৪]

পৈশাচিক বীভৎসতার আবহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্মশানকালীর আরাধনা। তর্করত্ন হলেন প্রধান পুরোহিত। দেবী খুবই জাগ্রত। দেবীর কৃপায় নিশ্চয় থেমে যাবে মড়ক, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা। দেবীর সামনে সাজানো হয়েছে শিবাভোগ শেয়াল এসে সেই ভোগ গ্রহণ করলে তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ লাভ হবে। এটাই জাগ্রতা দেবীর নিয়ম।

অনেক প্রতীক্ষার পর পেট্রোম্যাক্সের আলো নিভে গেলে তর্করত্নের সাধনা সফল হয়েছে। স্বয়ং দেবী এসেছেন। তর্করত্ন রোমাঞ্চিত দেহে দেখেছেন -শিবাভোগের সামনে দুটো আগুনের মতো চোখ জ্বলছে আর সেই যাচ্ছে ঝাঁকড়া চুলের কালো রঙের অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। তবে কি স্বয়ং দেবীই এলেন প্রসাদ গ্রহণ করতে? ভোরের আগেই সমস্ত গ্রামে রটে গেল, শ্মশান কালী নিজে এসে ভোগ গ্রহণ করেছেন।

পূজো শেষে ট্রেন ধরার জন্য তর্করত্ন গরুর গাড়িতে করে স্টেশনের দিকে যাত্রা করেছেন। গাড়ির অর্ধেক ভরেছে দানে আর দক্ষিণায়। যুদ্ধের সময়ে কিছু মানুষের হাতে এত বেশি টাকা যে, তর্করত্ন তিনশোর পরিবর্তে দক্ষিনা পেয়ে যায় পাঁচশো। যাবার পথে গাড়োয়ানের চোখ পড়েছে-ডোম পাড়ার পাগলিটা রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে। মৃত্যু আসন্ন। পাগলীটার তিন ছেলে, স্বামী না খেতে পেয়ে মারা গেছে। পাগলিটাকে দেখে তর্করত্নের মনে ধন্দ জেগেছে। লেখকের বর্ণনায়-

> “কিন্তু একটা জিনিস তার্করত্ন বুঝতে পারেননি। তাঁর শ্মশান কালী এসেছিল ওই ডোম পাড়ায় পাগলিটার রূপ ধরেই-আর এখনও পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে--

> কালীর মত জীব মেলে হাঁপাচ্ছে এক ফোঁটা জলের জন্য। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেব ভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারেনি।"[৫]

পাগলিটা নিজের জীবনের বিনিময়ে তর্কাত্নের দেবী মাহাত্ম্যকে রক্ষা করেছে। চিরকাল গরিবেরাই আত্মবিসর্জন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে উচ্চকোটিকে। গল্পটি আমাদের লালন করা ধর্মের অলৌকিকতাকে চপেটাঘাত করে কোথাও যেন বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা করে।

যুদ্ধ, মন্বন্তর, মড়ক, দুর্ভিক্ষের প্রভাব শুধু মানুষ কিংবা প্রাণীর উপর পড়েছে তা নয়, প্রকৃতির উপরেও এর নির্মম প্রভাব এর ছবি একেছেন লেখক। বিশেষ করে প্রভাব পড়েছে নদীর উপর। নদী সাদা জল কালো হয়ে গেছে। নদীর স্রোত সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বহমান। দু'একটি গল্পে নদীর জল ও তার প্রভাব যুদ্ধের ভয়াবহতার রূপে প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিশেষভাবে প্রভাব পড়েছে –

১। নারীর সম্মানকে ভুলণ্ঠিত করে, তাকে পণ্য করে নরোত্তমেরা যেন মেঘনার জলকে কালো করে দিয়েছে।
২। দুর্ভিক্ষে আর মড়কে সন্ধ্যায় নদীর 'গলানো রূপোর' মতো জল কালো ও পিঙ্গলে মিশে যেন হিংস্রতার রূপ নিয়েছে।
৩। গল্পের প্রারম্ভে আড়িয়াল খাঁর জলের রং ছিল সাদা। তারপর নদীর উপর দিয়ে বয়ে গেছে কতশত মরা মানুষ। তারপর শীতল মাঝি, মথুরা দাসের চোরাকারবারির চাল নিয়ে যে খালের মধ্যে দিয়ে চলেছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন-

> "রাত্রি অন্ধকারে খালের সংকীর্ণ প্রচ্ছন্ন পথে কালো জল কলকল করে বয়ে চলেছে, যেন একটা সাপ নিঃশব্দে দংশন করে ক্ষীপ্র গতিতে লুকোতে চলেছে নিজের বিষাক্ত বিবরে।"[৬]

এই সময়কার গল্পগুলিতে মধ্যস্বত্বভোগী একশ্রেণীর দালাল কিংবা অসাধু ব্যবসায়ী, যারা অমানবিক, মূল্যবোধহীন-তাদের দেখা মেলে। 'বিতংস' গল্পের সুন্দরলাল, 'নক্রচরিত'-এর নিশিকান্ত কর্মকার, 'তীর্থযাত্রা'-র নরোত্তম, 'দুঃশাসন' গল্পের দেবী দাস, 'ডিম' গল্পের প্যারীলাল, 'কালোজল' এর মথুরা দাস কিংবা 'তৃণ' গল্পের পাইকার এ জাতীয় চরিত্র। এদেরই লোভ এবং স্বার্থপরতার মাশুল গুনতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। যদিও এদের নগ্নরূপ চিত্রিত করে লেখক এদের ঘৃণিত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন। সমান্তরালে সাধারণ মানুষের প্রতি লেখকের মমত্ববোধ ও সহানুভূতির স্পর্শ অনুভব করতে পারে পাঠক। তাই যুগশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থ বলেছেন-

> "মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিতে তাঁর বিকাশ।.... সেদিন সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবে ভেঙে পড়েছে জীবনের খেলাঘর। ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে; সঙ্গে সঙ্গে শবলুব্ধ গৃধ্রদের উচ্চস্বর বীভৎস চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস; একদিকে যুদ্ধের জুয়া খেলায় কাগজি-মুদ্রার ছিনিমিনি, অন্যদিকে চোরাকারবার আর কালোবাজারের নারকীয় অনাচারে পর্যুদস্ত দিন যাত্রা,... জীবনরুদ্রের উপাসক যুবশিল্পীর সৃষ্টিতেও জনচিত্তের এই সঙ্ঘবদ্ধ ক্রোধই রৌদ্ররসে রূপান্তরিত হয়েছে।"[৭]

তথ্যসূত্র:

১। দে, শিপ্রা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প। শৈলী প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ ১২ই জুলাই ১৯৯৬। কলকাতা। পৃ. ১৬৬।

২। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। গল্প সমগ্র। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪১৬। কলকাতা। পৃ. ৭৩২।

৩। তদেব, পৃ. ৫৭০।

৪। তদেব, পৃ. ৭৪৩।

৫। তদেব, পৃ. ৭৪৬।

৬। তদেব, পৃ. ৭৪০।

৭। ভট্টাচার্য, জগদীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*। ভারবি। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০০, জানুয়ারি ১৯৯৪। কলকাতা। পৃ. ১৫৪।